৩

ঠাকুরপকুর ক্যান্সার হাসপাতালের উপকণ্ঠে যাতায়াত হয়ে উঠেছিল একরকমের নৈমিত্তক রবিবাসরীয় প্রভাতী রুটিন। সন্ধ্যে বেলা যত অনাচারই হোকনা কেন, সকালের ওই অভ্যাসই হয়ে উঠেছিল, বলা চলে। তা, বছরে বাহান্নটা রোববারের হিসেবে, কম করে হলেও পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশটা রবিবার সাতসকালে কেবল চা টুকু ঠোঁটে ঠেকিয়েই রওনা হতাম ওই এলাকায়, পাওনাদার রূপে। সে সালটা তখন হবে ১৯৮৯ / ৯০.. ডক্টর মনমোহন সিংহ অর্থমন্ত্রী হননি তখনও.. বাবা'র সাথে হাত টাত ধরে বাজার-টাজারের পাট কবে চুকেবুকে গেছে। রীতিমতন দাঁড়িগোফ কামাই হপ্তা'য়, দুই কি তিনদিন। বাবা'রও পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স হতে চলেছে। আমি বারো ক্লাস কোনক্রমে পাশ করে, বিজ্ঞানের আর ইঞ্জিনিয়ারিং'এর দরজা'য় রাম-হোঁচট খেয়ে কমার্স পড়া ধরেছি।

ওই বলতে'ই বলেনা?.. বি কম্ মানে'ই বুদ্ধি কম। সেই বি কম্। আমার মা তো, তখন বড়ছেলে বি কম্ পড়ছে বলতে বেশ লজ্জা'ই পেতেন বোধহয়। আর সেকালের যুগে, আমাদের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবেশে, পড়শী, পরিজনেরা ভীষণ বেশিরকম কৌতুহলী.. মাত্রাতিরিক্ত উৎসুক ছিলেন, কার ছেলে কি পড়ছে, কি করছে, জয়েন্টে চান্স পেল কিনা, ফার্স্ট ডিভিশন, লেটার, এইসব অবান্তর মেধাভিত্তিক অঙ্ক'তে।

ছেলের তুলনায় মেয়েদের ব্যাপার'টা ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। বিয়ে হল কিনা, আর বিয়ে হলে বরের মাইনেকড়ি, কি কি গয়না দিলো, ক গাছা চূড়ি, শ্বশুরবাড়ী'র দুটো শস্তা গল্পগাছা, ইত্যাদি। মেয়ে সেকেন্ড ডিভিশনে গেলেও মর্মান্তিক ক্ষতির আশঙ্কা তুলনামূলক ভাবে কম.. যোগমায়া, মুরলীধর, বাসন্তী দেবী'ও চলবে। আর ভাল নম্বর পেয়ে প্রেসিডেন্সি, ব্রেবোর্ন, যাদবপুর হলে তো সোনায় সোহাগা। তা সে যে সাবজেক্টই হোক্ না কেন।

আমার মায়ের সেসময় বয়স বোধকরি বছর বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ হবে। দৈনন্দিন সাংসারিক টানাটানিতেই হবে হয়তো, নতুবা নিতান্তই স্বভাববশত কারণে, আত্মাভিমান বড় বেশি পরিমাণে দেখা দিত। যেন প্রশংসার্হ হতেই হবে ওই একটিমাত্র সম্বল বড় পুত্তুরটিকে। মায়ের শ্লাঘার বিষয় বলতে ছিল মূলত পাঁচটি হাতে গোনা প্রসঙ্গ, এক - সরু চালের গরমভাত, দুই - সুনীল শীর্ষেন্দু'র সাম্প্রতিক উপন্যাস, তিন - গরমকালে রাতের বেলায় বনবন করে মাথার ঠিক উপরে বেজায় জোরে পাখা, চার - ইনস্টলমেন্ট অর্থাৎ কিনা মাসিক কিস্তিতে বছরে দুচারখানা শাড়ী। আর সবচাইতে মুখ্য অভীষ্ট হল বড়'টি কে সত্যিকারের বড় করে তোলা। আর কিচ্ছু'টি নয়।

সেই বড়ছেলেই কিনা চরম ফাঁকিবাজিতে, জয়েন্টে গাড্ডু? ব্যাপক ধাক্কা খেয়েছিল মায়ের এহেন আত্মগৌরব। তবু হালটি ছাড়েননি.. এই যেমন, কেউ যদি হুট করে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসত, ছেলে কি করছে গো? মা অবলীলাক্রমে বি কম্ না বলে, চটজলদি বলে দিতেন, এই তো.. সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ঢুকল। সত্যি কথাই বলেছেন, এক বর্ণ মিথ্যে নেই এতে। আর বলে ফেলেই একটা গর্ব মেশানো সাফল্যের হাসি। কি ছাতার মাথা যে ছেলেটি পড়ছে সে কলেজে, সে আর স্পষ্টভাবে খোলাখুলি বলতেন না। অনায়াস দক্ষতায় কাটিয়ে যেতেন। বলা বাহুল্য, প্রশ্নকর্তাও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরেরই কেউ হবেন, ওই সামান্য সেন্ট জেভিয়ার্স নামেই ক্লীন বোল্ড্। কেউ যদি দু চার কথা বেশি বলেন.. সঙ্গে সঙ্গে স্বামী স্ত্রী একজোট হয়ে পাখিপড়া বুলি আওড়াতেন, ইঞ্জিনিয়ারিং'এর জামানা শেষ.. হবেটা কি? চার্টার্ড বানাব ভাবছি ছেলেকে.. আর ডাক্তারির ঝুঁকিটা ভেবে চিন্তেই নিলামনা, বুঝলেন? ও বড্ড সময় লাগে দাঁড়াতে।

আমার কলেজ ছিল সকাল ছ'টায়। দশ'টায় আগেই ছুটি। ক্লাস শেষে, বিঁড়ি টিড়ি ফুঁকে, আড্ডা'য় গানে, আরও অনেক প্রকার লেখার অযোগ্য অধমতম অকর্ম কুকর্ম করে, বিনাটিকিটের ট্রামে চেপে দুপুর বারোটা'য় বালিগঞ্জের বাড়ী (ঢাকুরিয়া'র মাসি'দের বাকীটা না'হয় পরবর্তী কিস্তি'তে হবে)।

কয়েক'টি হাতে গোনা কোচিং ক্লাসটাসও থাকত সন্ধ্যার দিকে, তা সে না গেলেও চলে। আর বাকী সময়? নিখাদ বাংলা 'ঠেক' বলতে যা বলে, এককথায় তাই। তার সাথে আর পাঁচটা বিশ্ববকাটে ছেলের মতই, মাঝে মধ্যেই একটু ব্রিজ খেলায় হাত পাকানো, একটু ক্যারাম, লেবু চায়ের দোকান.. যাকে বলে একদম দিনগত পাপক্ষয়। ওই লোকাল কমিটি, পার্টি অফিস, নাগরিক কমিটি টুকুই যেটুকু বাকী পড়েছিল। নইলে এক্কেবারে নিয়মানুগত বাঙালী বেকার যুবক.. বি কম্ পড়ে, ঘরের খায়, আর তাড়ায় বনের মোষ।

তখন সবদিনই মনে হয় রবিবার। কাজ নেই তো খই ভাজ্ গোছের গতানুগতিক জীবনক্রম। বাবা তো চিরকালই গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন, দরকার ছাড়া কথা কমই বলতেন ছেলের সঙ্গে। এমনকি, আমার কৌতুকপ্রিয় মা'কেও সময়ে অসময়ে আমার প্রতি অলঘু ব্যবহার করতে দেখেছি। বেকারত্ব আর সম্ভবত, ঐ কালান্তক জয়েন্ট এন্ট্রান্সটা বড়সর একটা ধাক্কা দিয়ে গিয়েছিল আমার মা'য়ের মনে। এমনকি, বেশ দুচারটে রোববারে বাবা মা একত্রে সন্ধ্যের দিকে বেড়িয়ে বঙ্কিমবাবুটাবু দের কাছে কুষ্ঠিবিচারও করিয়ে একটা রূপোয় বাঁধানো পান্না'র আংটি'ও পড়িয়ে দিলেন আমার ডান হাতের মধ্যমা'য়। যদি ছেলের মতি স্থির হয়। পান্না শুনেছি 'বুধ' কমের ওষুধ.. আর বুধের অভাব মানেই বুঝতেই হবে যে বুদ্ধি কম.. এক কথায় বি কম্।

মা বাবার মন কাড়তে নিজে নিজেই ভেবে ঠিক করেছিলাম, অগত্যা রোজগার করাটা আবশ্যক। তখন বি কম্ পড়ুয়া গড়পড়তা সত্তর ভাগ বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেপুলে হয় প্রেম করত, নয় প্রেমের আপ্রাণ প্রতিনিয়ত চেষ্টা (যেটিকে পরিভাষায় ছক বলা হত, এখনও হয়তো তাই'ই বলা হয়)। বাকী তিরিশ ভাগে'র কুড়ি ভাগ নিছক বাপের হোটেলে খেয়ে থেকে, গ্রুপ থিয়েটার বা তথাকথিত নন্দন একাডেমি চত্বরে গাঁজা আর বেকসুর আঁতলেমি। বাকী দশের, আটটি সিপিএম, দুটি কংগ্রেস (দিদি ছিলেন স্বমহিমায়, কিন্তু তিনোমুল তখনও হয়নি কিনা)। কি প্রকারে যে সেই আট দুই'এর হিসেব এখন দুই আটে এসে ঠেকল, তার বিবরণ না হয় অন্য কোনো সময় দেওয়া যাবে। সেও বঙ্গজীবনের এক অঙ্গ বৈকি।

মিঠুন'দা তখন নায়ক হিসেবে অস্তগামী। জ্যাকি শ্রফ, অনিল কাপুর ও সানি দেওল হয়ে উঠেছিলেন হিন্দি ছবির নয়া মানদন্ড (বাপরে!) আর তাঁরই কিনা মহৎ প্রেরণায়, সে সময় বডি বিল্ডিং নামক একটি নেশাও ঘোরতর পেয়ে বসেছিল যুব সমাজকে। অবশ্য উচ্চবিত্তদের মধ্যে সে নেশা বেশী প্রকট হত। সে পথ মাড়াইনি অবশ্য কোনদিনই। একেই বুদ্ধি কম, তার ওপর নিশ্চিত ধারণা ছিল, লোহা লক্কর মাথার উপরে তুললে যদি বুদ্ধি যায় আরও কমে?

আমার কাছে তখন দিন মানেই রোববার, গান মানেই কুমার শানু, আর সময় কাটানো মানেই বন্ধুভাবাপন্ন বেকার জীবন। ধুপধুনো দিয়ে ঠেক মারতে বসি সন্ধেযবেলা ঠিক ছ'টায়.. চা সিগারেটে তুফান তুলে.. বাড়ী ঢুকতে ঢুকতে ন'টা সোয়া ন'টা। মাঝে মধ্যে দেখতাম আমার পুত্রতুল্য ছোট ভাইটি তার দাদার আড্ডাঠেকের সামনে দিয়ে ঘুরে গেল এক দুই বার। বুঝতাম, মা গুপ্তচরের কাজে লাগিয়েছেন শিশু ভোলানাথ'টিকে।

দুর্ভাগ্যক্রমে টিউশনিও বরাদ্দ ছিল তথাকথিত ইঞ্জিনিয়ারিং'এর ছাত্রদের। বললাম না, কথায় বলে, বি কম্ মানেই বুদ্ধি কম। ছাত্রের মা'ও খুঁজছেন যাদবপুর শিবপুরের সম্ভাবনাপুর্ণ, মোটা ফ্রেমের চশমাধারী, হাতে টি (জ্যামিতিক যন্ত্র) বহনকারী ভবিষ্যতে'র ইঞ্জিনিয়ারকেই। আরে বাবা, ওটুকু ত্রিকোণমিতি আমিও জানি, ক্যালকুলাস আমিও খেয়েছি গুলে, কে বোঝাবে কাকে? হয় ওই থোড়বড়িখাড়া দিনগুলোর স্বাদবদল করতে, নয় বাপ মা'র কাছে একটু নাম কিনতেই বেছে নিয়েছিলাম ঠাকুরপকুর। সেও ওই সেই প্রতি রোববার রোববার, সকালের দিকটায়.. কারণ সন্ধ্যে বেলায় যাত্রা নাস্তি.. বিভিন্ন ঠেকে আড্ডা জমানোর গুরুদায়িত্বটা যে কেবল আমার।

রবিবারে সক্কাল সক্কাল হানা দিতাম প্রবীরবাবু (আসল নাম বদল করা হয়েছে) নামে এক নিতান্ত অসাধু প্রতারকের ডেরায়। ঠাকুরপুকুরে। আমার বাবার কষ্টার্জিত বেশ হাজার চল্লিশেক টাকা মত, জমি বেচার নাম করে গাপ করে দিয়েছিলেন, ঐ দালাল ভদ্রলোকটি। রোববার গুলো চলে যেত, ওঁর বেআইনি কাজকম্ম বনাম আমার নিষ্পাপ, ছলচাতুরীহীন, অনাড়ম্বর ভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা ওঁর দালানে বসে সময় কাটানো। প্রথম দিকে বেশির ভাগ রবিবার গুলো ফুটিয়ে দিতেন ভুজুং ভাজুং আবোল তাবোল স্তোকবাক্য দিয়ে। পরে দেখলেন ছেলের পাওনাদারির অধ্যবসায়। আন-সান না বকে, শেষের দিকে রোজই প্রায়ই নিয়মিত দুপাঁচশো দিতেন, প্রতি রোববারে। যদ্দুর মনে পড়ে, বাবার পাওনা টাকা জোগাড় করেছিলাম সবমিলিয়ে প্রায় হাজার দশেক.. জীবনের চল্লিশটি রোববারে দশটি হাজার! তা নিতান্ত মন্দ নয় ওই বেকার জীবনে। ওই আমার আঠারো বছর বয়সের প্রথম রোজগার। বাবার পাওনা টাকা বাবার হাতে তুলে দিতে পেরে, সে কি চমৎকারিত্ব, কি গুমর.. সে পাওনাও তো রোববার বলে'ই সম্ভব হল!

আহারে! ওই অসীম অধ্যবসায়, ওই ঐকান্তিকতা যদি নিরেট ফাঁকি না মেরে জয়েন্টে দেখাতাম, আজ অ্যাদ্দিনে খাঁটি পাক্কা ইঞ্জিনিয়ার.. মা'র মুখে নিশ্চিত দেখা যেত অমলিন যুদ্ধজয়ের হাসি.. (অবশ্য সত্যিই যে বাজার দেখছি ইদানীং, কদ্দিন মায়ের মুখে সে হাসি

টিকতো, তা বঙ্কিমবাবুরও বলা অসাধ্য..).. তা যাই হোক, আর কিছু না হলেও, মা ও বাবা'কে অবিচল থাকতেই দেখেছি, দশটি হাজার নগদ পেয়ে গিয়েও।

কাজের মধ্যে শুধু মধ্যমা'র পান্না'টি রূপো ছেড়ে সোনায় বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন বাবা মা.. পাথরে কাজ দিচ্ছে বলে কথা..

ক্রমশ....